Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গদ্যকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

Volume	40
Issue	1
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	October 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.7
Pages	109-120
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গদ্যকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

সৌমিত্র শেখর

বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের তিরিশ দশকে বাংলা কাব্যজগতে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার প্রাণপুরুষদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অন্বিষ্ট ছিলো ছন্দদোলানির্ভর প্রচলিত কাব্যাঙ্গিকের বিরোধিতা, বিষয়বস্তু নির্বাচনে আটপৌরে ও প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পরিচিত বস্তু আমদানীর মাধ্যমে এমন একটি কাব্য পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে অন্তত আর একজন থাকবেন না; তিনি বিষ্ণু দে'র ভাষায় : "সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।" [ছেদ/'উর্বশী ও আর্টেমিস']

তৎকালীন প্রচলিত কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তিরিশের প্রধান কবিদের মধ্যে প্রথম দিকে রবীন্দ্র-বিরোধী হয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের রবীন্দ্র -বিরোধিতা, পরবর্তী পর্যায়ে এই মনোভাবের পরিবর্তন— কেন, এ প্রসঙ্গ আমাদের বর্তমান আলোচ্য নয়। যে কারণেই তিরিশের কবিরা রবীন্দ্র -বিরোধী হোন না কেন; আমাদের বিবেচনায়, তাঁরা যে কাব্যাদর্শ নিয়ে এগিয়ে এলেন, সেই কাব্যাদর্শের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন প্রথম দেখা গেলো কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যেই। বিপুল বিস্ময় নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্রময় পথ চলা। এ পথেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আমরা পেয়েছি 'গদ্যকবিতা'। এ ধরনের কাব্যভাবনার প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ করা যায় "লিপিকা"য় (১৯২২); সুপরিণত রূপ "পুনশ্চ"তে (১৯৩২)। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে "ঝরাপালক" (১৯২৭), "তন্বী" (১৯৩০) "উর্বশী ও আর্টেমিস" (১৯৩৩) কালের দিক থেকে "লিপিকার" বেশ পরে প্রকাশিত। এসব গ্রন্থে প্রত্যেক কবির কাব্য-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেলেও সর্বতোভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত কেউ হতে পারেননি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তন্বী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করে "ভূমিকা"য় যে বিষয়টি উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হননি তা হলো : "কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।"[১] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এ উক্তি শুধুই তাঁর

বিনয় ভাষণ নয়, এর বক্তব্য-বিষয় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তিরিশোত্তর প্রধান কবিদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে কম বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

"পুনশ্চ" রবীন্দ্রনাথের পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর চেয়ে প্রসঙ্গ ও প্রকরণে সর্বাংশে ব্যতিক্রমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে যে রীতি অনুসরণ করেছেন তাকে তিনি বলেছেন "গদ্যিকা রীতি"—আর আমরা এই কবিতাগুলোকেই অভিহিত করছি "গদ্যকবিতা" বলে। "পুনশ্চ"র পূর্বে "লিপিকা"তে এর প্রয়োগ প্রয়াস লক্ষ করা গেলেও রবীন্দ্রমনে "গদ্যকবিতা" সম্পর্কে ভাবনা আসে ইংরেজী গদ্যকবিতার রস পেয়ে 'একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে "গীতাঞ্জলি"র গানগুলি 'ইংরেজি গদ্যে' অনুবাদ করার সময়। তাঁর অনুবাদ কর্ম 'এমন সব প্রশংসাবাদ' লাভ করেছিলো যাকে অত্যুক্তি মনে করে' তিনি তখন 'কুণ্ঠিত' হলেও[২] পরবর্তীসময় সে রসকে বাংলা কাব্যে আনা যায় কিনা এ নিয়ে ভেবেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবির অনুরোধ সত্ত্বেও 'চেষ্টা করেননি'। অবনীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর 'ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি'।[৩] অবশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই রস সৃষ্টি নিরীক্ষার কাজটি হাতে নেন। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে "লিপিকা"র প্রথম দিককার লেখাগুলো প্রকাশিত হলে কবির ও নিরীক্ষা একটি স্থির রূপ লাভ করে। "লিপিকা"র 'সন্ধ্যা-প্রভাত' লেখাটি কবিতার মতো সাজালে এক গদ্য কবিতার রূপ নেয় :

"অন্ধকারে এখানে/ কেঁপে উঠছে/রজনীগন্ধা,
বাসর ঘরের দ্বারের কাছে/অবগুণ্ঠিতা/নববধূর মতো;
কোনখানে ফুটল/ ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।"
[সন্ধ্যা-প্রভাত/'লিপিকা']

কিন্তু এমন সার্থক কবিতাও প্রকৃত গদ্যকবিতার মর্যাদা পায়নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, ছাপবার সময় পদগুলি খণ্ডিত করা হয়নি। কবির ব্যাখ্যায়- "বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ"।[৪] অথচ, পরবর্তীসময় "লিপিকা"য় প্রকাশিত গদ্য কবিতার 'বিশুদ্ধতা' সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "লিপিকা, কেন ভালো লাগে? সেতো গদ্য কবিতা, বিশুদ্ধ গদ্য কবিতা। লেখাটা গদ্যের ছাঁদে, এইমাত্র তফাৎ।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের এ নিরীক্ষার সযত্ন প্রয়াস হয়তো "লিপিকা" থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু তাঁর "শারদোৎসব" (১৯০৮), "রাজা" (১৯১০) কিংবা "ডাকঘরের" (১৯১১) মতো নাটকে যে বহু কাব্যগন্ধী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে এর পশ্চাতে রবীন্দ্রমনে অবচেতনভাবে সতত ক্রিয়াশীল ছিলো এই গদ্যকবিতার ধারা— একথা বলা যেতে পারে। তিরিশের কবিরা যে কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে

একদিন হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্র-বিরোধী; রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় আমরা যেন সেই কাব্যাদর্শের পূর্বরাগিনী শুনতে পাই। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ এবং তাঁদের সমসাময়িক আরও অনেকে বাংলা কবিতায় শব্দ ব্যবহারের এবং ভাবের আবহে যে নতুন চৈতন্যের পরিচয় দিলেন তার সূচনা রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন— একথা প্রমাণ করা যায়। তিনি [রবীন্দ্রনাথ] নিজেই অনুভব করেছিলেন যে কবিতার সনাতনী সীমার মধ্যে মাঝে মাঝে আবহাওয়া বদল হয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই অনুভবের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাব্যের প্রচলিত রীতির মধ্যে 'আবহাওয়া বদল' বিষয়ে ভেবেছিলেন। অবশ্য তাঁর এ ভাবনা গদ্যের গ্রহণ ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে সচেতন আস্থা থেকে উদ্ভূত। "গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক" (১৯৭৮) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি উল্লেখ করেন যে, শুধু 'পদ্যই কাব্য নয়, 'গদ্য'ও কাব্য হতে পারে। এই গ্রন্থে কতিপয় কবিতার সঙ্গে তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> "কবিতা পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল।"[৭]

শুধু তাই নয়, গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার সময় তাতে "পুষ্পনাটক" নামে আরও একটি প্রবন্ধ সংযোজন করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন : এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল।"[৮] গ্রন্থটির নাম প্রথমে "কবিতা পুস্তক" থাকলেও পরবর্তী প্রকাশের সময় "কবিতা পুস্তক" অপেক্ষা 'গদ্যপদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী" বিবেচনা করে তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন : "গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক"। [৯]

এতদ্‌বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর চিন্তাকে আরও অগ্রসর করেছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতা নিয়ে বহু ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। তাঁর একাধিক গ্রন্থে, পত্রালাপ, গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে কবি-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। "কাব্য ও ছন্দ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ছন্দ [পদ্যছন্দ] কাব্য সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য উপাদান নয়। তাঁর ভাষায় :

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা সেই রসের পরিচয় দেয় আনুষাঙ্গিক হয়ে— সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার।"[১০]

গদ্যকবিতা নিছক গদ্য নয়, আবার পুরোপুরি 'পদ্যকবিতা'ও নয়। গদ্যের মধ্যে পদ্যছন্দের আভাস এনে গদ্যকবিতা রচিত হতে পারে। গদ্যকবিতার ছন্দ পদ্যছন্দের মতো বাঁধাধরা কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত না হলেও তা' কবির ছন্দোবোধের দ্বারা সংযমিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন :

"এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি। সেই সংযমের গুণে থেমে-যাওয়া কিংবা হঠাৎ-বেঁকে-যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্ছে না।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, "গদ্যই হোক পদ্যই হোক রচনামাত্রেরই একটা ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত— সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়।"[১২] ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "পুনশ্চ" কাব্যের ছন্দকে গানের আলাপের সঙ্গে তুলনা করে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পত্রে তাঁকে লিখেছেন :

"গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।"[১৩]

তাঁর মতে : "পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে।"[১৪] এই আধিভৌতিকের মধ্যেই আছে বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা। গদ্য কবিতায় এই বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা ফুটে ওঠে। তিনি লিখেছেন :

"তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানা প্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্র্যশক্তি আছে।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় পদ্যছন্দের চলন নাচের চলন, আর পদ্যছন্দের চলন স্বাভাবিক চলন। কবি শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখেছেন :

"গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোনো গতির মধ্যে নাচের ধরনটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি কোনো ছন্দে বাঁধন কম, তবু ছন্দ মাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে। সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাঁকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল. তাতে অসুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই।"[১৬]

গদ্যকবিতার পর্ব বিভাজন হয় অর্থকে অবলম্বন করে, আর 'পদ্যকবিতা'র পর্ব বিভাজনের মুখ্য বিবেচনা ধ্বনি। সেদিক থেকে গদ্যকবিতার পর্বকে 'অর্থপর্ব' বলা যেতে পারে। আবার গদ্য কবিতার পর্বগুলি ভাবানুযায়ী বিন্যস্ত হয় বলে এ পর্বগুলিকে 'ভাবপর্ব' বলা যায় আর সে বিচারে গদ্যকবিতার ছন্দকে 'ভাবছন্দ' বলাও অসঙ্গত নয়। যেহেতু বাক্যের ভাব-অর্থ নিষ্পন্নের মাধ্যমে ভাবছন্দ অর্থাৎ গদ্যছন্দ এগিয়ে চলে, সেহেতু গদ্যছন্দ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী এবং তা অতিনিরূপিত নয়। এই স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্তরঙ্গতা গদ্যছন্দের বাহুল্য বর্জনেরই ফলশ্রুতি। তাই বলা যায় যে, নির্যাস-নির্ভরতা গদ্য কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাহুল্যবর্জন ও নির্যাস নির্ভরতার জন্যে গদ্য কবিতার ছন্দ প্রায়শই প্রচ্ছন্ন থাকে বলে সাধারণ গদ্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য কল্পনা করার মতো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু দেখা যায়, সাধারণ গদ্য থেকেও এর পার্থক্য বিস্তর। এমতাবস্থায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নানা ভাবনায় ভাবিত— অবশেষে তার একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা দেখা যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে :

"পুনশ্চ'র কবিতাগুলোকে কোন সংজ্ঞা দেবে। পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে, না ঘোড়া বলবে? গদ্যের পাখা উঠেছে একথা যদি বলি, তবে শত্রুপক্ষ বলে বসবে, 'পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। জলে স্থলে যে সাহিত্য বিভক্ত, সেই সাহিত্যে এ জিনিসটা জল নয়, তাই বলে মাটিও নয়। তা হলে খনিজ বলতে দোষ আছে কি? সোনা বলতে পারি এমন অহংকার যদি বা মনে থাকে মুখে বলবার সাহস নেই না হয় তামাই হল। অর্থাৎ এমন কোনো ধাতু যাতে মূর্তি গড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ রূপরশত্মাক গদ্য. অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃত গদ্যকবিতার গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতে পারে "পুনশ্চ' (১৯৩২), "শেষ সপ্তক" (১৯৩৫), "পত্রপুট" (১৯৩৬) ও "শ্যামলী" (১৯৩৬)। সুকুমার সেন বলেছেন : "আসল গদ্যকবিতার লক্ষণ— বিষমমাত্রিক

যতি, অসম ছন্দঃস্পন্দ এবং গদ্যোচিত বাচনভঙ্গি— সবই এখানে আছে।"[১৮] উপর্যুক্ত কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় কবি গদ্যকবিতার স্বরূপ ও চারিত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। "পুনশ্চ"র 'কোপাই' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তার নব্যসৃজিত গদ্যকবিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের গা-ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া কোপাই নদীর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। কারণ—

"ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জলস্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে। [কোপাই/'পুনশ্চ']

গদ্যকবিতার 'মুখে' 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা' এবং সকলের সঙ্গে এর গলাগলি ভাব। কিন্তু 'পদ্যকবিতা' 'লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।' [ওই] কোপাই নদীর প্রসঙ্গক্রমে কবির জীবন ও সাহিত্যে 'পদ্মা' নদীর প্রভাবের কথা স্মরণে আসে। পদ্মাকে কবির পূর্বে রচিত 'পদ্যকবিতা'র প্রতীক বলে ধরে নিলে কোপাইকে গদ্যকবিতার প্রতীক বলে মনে করা যায়। কেননা ঐশ্বর্য ও দৈন্য এই পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্য সাঙ্গীকৃত করে কোপাইয়ের যেমন বয়ে চলা, গদ্যকবিতার পথপরিক্রমাও একইভাবে; অথচ কোপাইয়ের মতো গদ্যকবিতাও ঐশ্বর্যের গর্বে যেমন উদ্ধত নয়, দৈন্যের স্পর্শেও তেমনি মলিন নয় :

"তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন;
এই দুয়েই তার শোভা " [ওই]

"পথে ও পথের প্রান্তে" (১৯৩৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, পদ্য সমুদ্রের মতো, তরঙ্গ বৈচিত্র্যই যার প্রধান ও একমাত্র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর গদ্য স্থলভাগ সদৃশ্য; পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-মরুভূমির মতো নানা রকম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত ঐক্যরূপ। তিনি ঠিক একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন "নাটক" কবিতায় :

"পদ্য হল সমুদ্র
সাহিত্যে আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দ-তরঙ্গে,
কলকল্লোলে!

গদ্য এল অনেক পরে
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।" [নাটক/'পুনশ্চ']

এ কবিতার শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার আন্তবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এভাবে :

"সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।" [ওই]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা যথেষ্ট বাহুল্য বর্জিত ও নির্যাস-নির্ভর। গদ্যের সংহত বাক্য পদ্যের মতো খণ্ডিত হয়ে ভাবগতিকে স্পষ্ট করে সর্বাংশে গতানুগতিকতাবিরোধী ও আধুনিক করণকৌশলে উপস্থাপিত এ কাব্যাঙ্গিক। "শেষ সপ্তক"র ২৪ নং কবিতা ছন্দের পুরাতন দেয়াল ভেঙে ফেলবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে কবিকণ্ঠে। সেই সঙ্গে তিনি তার এই নূতন কবিতাকে তুলনা করেছেন ছুটি পাওয়া নটীর সঙ্গে— যার উচ্চ হাসিতে চকিত চারিদিক, যে স্বাধীন ও মুক্তগামী। ২৫ নং কবিতাতেও এই একই বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে অন্য প্রতীকাশ্রয়ে:

"[... ... ...] টবের কবিতাকে
রোপন করবো মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।" [২৫ নং/'শেষ সপ্তক']

মৌখিক ভাষার ছন্দই গদ্য কবিতার প্রধান অবলম্বন— যেখানে মাত্রাগুচ্ছের বিন্যাস ও সংখ্যা এবং তার পুনরাবর্তের কোনো সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক নিয়ম নেই। এই অমিল মুক্তক ছন্দের ব্যবহার উল্লিখিত গদ্যকাব্য গ্রন্থাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ সময় রবীন্দ্রনাথ মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি এসেছেন। তাই তার গদ্য কবিতায় পদ্যের ব্যবহৃত শব্দের বর্জন ও কথ্য ভাষার বাগভঙ্গি ব্যবহার দেখা যায়। কবির ভাষায় :"পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তার', 'সনে', 'মোর', প্রভৃতি— যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিই নি।"[১৯] নির্বিচারে শব্দ ব্যবহারের উদাহরণ 'বাঁশি' থেকে উল্লেখ করা যায় :

"গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি কাঁঠালের ভূতি
মাছের কান্‌কা-" [বাঁশি/ 'পুনশ্চ']

খেয়ালের বশে বা 'বাধ্য' হয়ে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। তিনি স্বেচ্ছায় এবং সুচিন্তিতভাবে

যে এ জাতীয় শব্দচয়নে মনোযোগী হয়েছিলেন তা স্পষ্ট হয় মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে কবির কথোপকথনে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন :

"নিয়ে এস 'পুনশ্চ' তোমার কিনু গোয়ালার গলিটা শোনাই।'
পড়লেন কবিতাটা।

কিনু গোয়ালার গলি
লোহার গরাদ দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই— ইত্যাদি

সেই লোনাধরা স্যাঁতাপড়া দেওয়ালের মাঝখানে কাঁঠালের ভূতি আমের খোসা ছড়ানো ডাস্টবিনের পাশে পঁচিশ টাকা বেতনের কেরানীর জীবনযাত্রা চলেছে। সেই জীবনের মধ্যেই স্বপ্ন জাগে, পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর পরে যে অপেক্ষা করে আছে— কিনু গোয়ালার গলির সীমানায় তার আবির্ভাব আর অন্য কোনো ছন্দেই চলত না, গদ্যছন্দ ছাড়া লিখলে সে একেবারে অন্য জিনিস হোতো, এ জিনিস নয়।"[২০]

সম্পূর্ণ কথ্য ভাষার ভঙ্গি বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ তার গদ্যকবিতায় অতি গভীর ভাবকে সহজে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশভঙ্গির চেয়ে এখানে বক্তব্য বিষয়ই মুখ্য। উপমা প্রয়োগ-বিশিষ্টতা, ছন্দের গদ্যভঙ্গি, অলঙ্কার বর্জিত তীব্র সংবেদনশীল ভাষা ইত্যাদি এই পর্যায়ের কাব্যগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, অনভিজাত ও অভিজাত সব রকম ভাব প্রকাশে এই ভাষা সক্ষম। এ ভাষা তাই সহজেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। শুধু শব্দ ব্যবহারই নয়, উপস্থাপন রীতিতেও প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, "শ্যামলী" কাব্যগ্রন্থের 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় :

"একটুকু রইলেম চুপ করে
তারপর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"
[হঠাৎ দেখা/'শ্যামলী']

এই ঢঙটি নিতান্তই কথ্য ও আলাপচারিতার ঢঙ; প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সঙ্গে যার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

গদ্যকবিতার সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যকবিতা রচনা সম্পর্কে সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন :

"পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে।"২১

কিন্তু এতো কিছুর পরও কবি যেনো নতুনকালের বাণীরূপ এই গদ্যকবিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। মৈত্রেয়ী দেবীকে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এই গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ এখনও মেটেনি, তাই কিছুতেই মন ঠিক হয় না। বার বার লিখি আর বদলাই, উল্টে পাল্টে একটা কথা জুড়ে একটা বা ছেঁটে, ও একটা শিল্প।"২২

বস্তুত তাই। রবীন্দ্রনাথ পদ্যছন্দের মতো গদ্যছন্দে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়তো করতেন না। এ জন্যে চিরাচরিত অভ্যাস ত্যাগ করা কবির সচেতন-সচেষ্টার পরও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। "পুনশ্চ"-র ভূমিকাতে পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার ঘোষণা দেবার পরও তার 'বাঁশি' কবিতাতে ধলেশ্বরী "বহি" চলে। "পত্রপুটে"র 'আফ্রিকা' কবিতাটি গদ্যকবিতার ঢঙে প্রকাশের পর এর ছন্দোবদ্ধ পাঠ "কবিতা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া "শেষ সপ্তকে"র ৩৪নং কবিতার পদ্যরূপ "প্রান্তিকে"র ১৬নং কবিতাটি। কবিতা দুটোর পাঠ মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, গদ্যের তুলনায় পদ্যে ভাব গাঢ় ও সংহত এবং প্রকাশিত ওই ভাব প্রকাশের জন্যে যেনো পদ্যছন্দই উপযুক্ত। কিন্তু তারপরও রবীন্দ্রনাথ প্রচুর গদ্যকবিতা রচনা করেছেন। প্রশ্ন জাগে— কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তর্কে' :

"[রবীন্দ্রনাথ বলছেন:] আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, অনেক কথা আছে যা কখনই মিলের কবিতায় লেখা চলে না। যা একমাত্র গদ্য ছন্দেই প্রকাশিত হতে পারে।

[মৈত্রেয়ী দেবী:] গদ্যে লিখলেই হয়!

[রবীন্দ্রনাথ:] না তা-ও নয়, গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্য কবিতাতেই যথার্থ সুন্দরভাবে প্রকাশ হতে পারে এমন কথাও আছে।

[মৈত্রেয়ী দেবী:] যখন গদ্য কবিতা লেখা হ'ত না তখন সেগুলোর কি অবস্থা হোতো?

[রবীন্দ্রনাথ:] তখন সেগুলো লেখাই হ'ত না। যেমন ধর না ভাষা, আজকাল কত পরিবর্তন তার হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও কত কথা, যা লোকে এখন সহজে অনায়াসে বলে, তা বলতে পারত না। এখন তোমরা যে ভাষায় কথা কও কন্যে, যে ভাষা তোমাদের জন্যে তৈরি করেছি, আমাদের যুগে এ ভাষায় মহাপণ্ডিতরাও কথা কইতেন না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, ক্রমে গড়ে উঠছে। যখন ভাষা ছিল না, মানুষের ভাবনাও কম ছিল। তেমনি যখন গদ্যছন্দ ছিল না, তখন গদ্য ছন্দে আজ যা লেখা হচ্ছে তা লেখা হতে পারত না। যেমন ধর সেদিনকার কবিতাটায়— দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে. কাছে বসে ছোকরা দারোয়ান কুটচে দোক্তা. উঠানে ঘোড়া দুটো সকাল বেলাই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা— এই যে ছবিটা, এ কখনও মিলের কবিতায় দেওয়া চলত না। এই সমস্ত ছবিটা বাদ দিয়ে এতোটুকু ভাবরস ছেঁকে তুলতে হোতো তাতে বাদ পড়ত অনেক। ওই যে নেয়ামৎ ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছে আর চন্দ্রভান দাড়ি আঁচড়াচ্ছে, এই দৈনন্দিন পটভূমির উপরই বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে।"২৩

রবীন্দ্রনাথ কথিত উপর্যুক্ত 'দৈনন্দিন পটভূমি'ই হচ্ছে তার গদ্যকবিতা রচনার প্রধান ভিত্তি। উপর্যুক্ত এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও সংহত ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> "এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে, হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং সেজন্যেই তাদের সত্যিকার কাব্যগোত্রীয় বলে মনে করি।"২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্যকবিতা ও এর বিষয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সার্বিকভাবে সচেতন ছিলেন। বাংলা কাব্যাঙ্গনে 'দৈনন্দিন পটভূমি' বা 'প্রাত্যহিক ভাব' প্রকাশার্থে গদ্যকবিতায় তারই প্রথম সচেতন পরীক্ষা-প্রয়াস এবং প্রতিষ্ঠা লাভ। একটি প্রচলিত কাব্যরীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পর এর সমান্তরাল আর একটি

সম্পূর্ণ নতুন কাব্যাঙ্গিকের পরীক্ষা, প্রতিষ্ঠা ও সে ভাবকে লালন করার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তিরিশ ও তৎপরবর্তীকালের কবিদের গদ্যকবিতা রচনা ও এর কাব্যসম্ভাবনার প্রান্তর উন্মুক্ত করেন। প্রতিভার বিচিত্রমুখিতা, শোষণ-ধারণ ও প্রকাশ ক্ষমতার বিস্ময়কর সমন্বয় কবিমনে সাধিত হয়েছিলো বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় যুগসীমা অতিক্রম করে কাব্যক্ষেত্রে আগামীযুগের কবিদের থেকেও হলেন অগ্রগামী।

তথ্যসূত্র

১। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক লিখিত "তন্বী" কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪, কলিকাতা, পৃ. ৩৪৯

২। সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌষ ১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, পৃ. ৪১ দ্রষ্টব্য

৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা', পুনরমুদ্রণ মাঘ ১৩৬০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ৩

৪। প্রাগুক্ত

৫। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৫, মুক্তধারা, ঢাকা; পৃ. ১৮

৬। আধুনিক বাংলা কবিতা [প্রবন্ধ], সৈয়দ আলী আহসান, ভাষা-সাহিত্য পত্র, সম্পাদক; মু. ইদরিস আলী, বিংশ বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৯, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭। বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত প্রথম প্রকাশ, একাদশ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯৭, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ১০৩৬

৮। প্রাগুক্ত

৯। প্রাগুক্ত

১০। ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৬২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ১৬২

১১। প্রাগুক্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখতি পত্র নং-৪, তারিখ : ৩ জুন ১৯৩৫, পৃ. ২০৯

১২। প্রাগুক্ত

১৩। প্রাগুক্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র নং-৩, তারিখ : দেওয়ালি ১৩৩৯, পৃ. ২০৪

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১৫। প্রাগুক্ত

১৬। প্রাগুক্ত, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পত্র নং-১, তারিখ : ২২ জুলাই ১৯৩২, পৃ. ২১১

১৭। প্রাগুক্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র নং-২, তারিখ : ৭ কার্তিক, ১৩৩৯, পৃ. ২০৩

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) সুকুমার সেন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২, কলিকাতা পৃ. ১৪৩

১৯। "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত

২০। মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-৯১

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

২২। মৈত্রয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৪। সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

২২। মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩